হাসপাতাল

হুমায়ূন আহমেদ

http://www.free-bangla-ebook.blogspot.com

http://www.facebook.com/Bangla.Ebook

ঢাকার বক্ষব্যাধি হাসপাতালের একটি কেবিন।

কবি শামসুর রাহমান শুয়ে আছেন। তাঁর নাকে অক্সিজেনের নল, গায়ে হাসপাতালের পোশাক নেই। লুঙ্গি-গেঞ্জি পরে শুয়ে আছেন। গেঞ্জি গলা পর্যন্ত ওঠানো বলে কবির বুক যে হাপরের মতো ওঠানামা করছে, তা দেখা যাচ্ছে। কবি চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে আছেন। তাঁর দৃষ্টিতে প্রাণের স্পর্শ নেই।

হাসপাতালের ওই কেবিনে আমার সঙ্গে আছেন সৈয়দ শামসুল হক এবং দৈনিক বাংলার সহ-সম্পাদক সালেহ চৌধুরী। আরো কেউ কেউ হয়তো ছিলেন, তাঁদের নাম মনে করতে পারছি না। আমরা নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে কবির রোগযন্ত্রণা দেখছি, হঠাৎ সৈয়দ শামসুল হক নৈঃশব্দ ভঙ্গ করলেন। তিনি কাঁপা কাঁপা গলায় বললেন, 'কবি, আপনাকে বাঁচতেই হবে। আমি আমার থেকে খানিকটা আপনাকে দিলাম।'

ঘোষণায় নাটকীয়তা ছিল, আবেগ ছিল; যুক্তি ছিল না। একজন তাঁর আয়ুর খানিকটা অন্যকে দিতে পারেন না। বাংলাদেশের সব মানুষ এক মিনিট করে আয়ু কবিকে দান করলে কবি বেঁচে থাকতেন তিন শ বছর।

তবে মোগল সম্রাট বাবর তাঁর পুত্র হুমায়ুনকে নিজের আয়ু দান করেছিলেন। ঘটনাটা এ রকম_হুমায়ুন মৃত্যুশয্যায়। চিকিৎসকদের সব চিকিৎসা ব্যর্থ। এ সময় সুফি দরবেশ মীর আবুল কাশেম সম্রাটকে বললেন, আপনি আপনার জীবনের একটি অতি প্রিয় জিনিসের বিনিময়ে পুত্রের জীবন ভিক্ষা করতে পারেন। এটা হবে শেষ চেষ্টা।

সম্রাট বাবর বললেন, আমার সবচেয়ে প্রিয় জিনিস হলো নিজ জীবন। এর বিনিময়ে আমি পুত্রের জীবন ভিক্ষা চাইব।

মীর আবুল কাশেম আঁতকে উঠে বললেন, কী সর্বনাশ! নিজের জীবন না, আপনি বরং বহুমূল্যবান কোহিনূর হীরা দান করে দিন।

সম্রাট বললেন, আমার পুত্রের জীবন কি সামান্য হীরকখণ্ডের তুল্যমূল্য?

আমি আমার জীবনের বিনিময়ে পুত্রের জীবন ভিক্ষা চাইব।

সম্রাট তিনবার পুত্রের চারপাশে ঘুরতে ঘুরতে প্রার্থনা করলেন। তিনবার বললেন, পুত্র, তোমার সমস্ত ব্যাধি আমি নিজ দেহে তুলে নিলাম। পরম করুণাময়, আমার প্রার্থনা কবুল কর।

হুমায়ুন অবচেতন অবস্থা থেকে চেতন অবস্থায় এসে পানি খেতে চাইলেন আর বাবর হলেন অসুস্থ।

আমার নিজের জীবনেও এ রকম একটা ঘটনা আছে। আমার ছেলে রাশেদ হুমায়ূনের বয়স দুই দিন। তাকে ইনকিউবেটরে রাখা হয়েছে। সে মারা যাচ্ছে। আমি হাসপাতাল থেকে শহীদুল্লাহ হলের বাসায় ফিরে এলাম। অজু করে জায়নামাজে দাঁড়ালাম। আমি ঠিক করলাম, সম্রাট বাবরের মতো নিজের জীবনের বিনিময়ে পুত্রের প্রাণ ভিক্ষা করব। জায়নামাজে দাঁড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে আমার মনে হলো, এই প্রার্থনা কবুল হবে।

শেষ মুহূর্তে প্রবল ভীতি আমাকে আচ্ছন্ন করল। আমি জীবনের বিনিময়ে জীবনের প্রার্থনা করতে পারিনি। আমি আমার মৃত শিশুপুত্রের কাছে লজ্জিত এবং ক্ষমাপ্রার্থী।

নুহাশ পল্লীর ঔষধি উদ্যানে একটি স্মৃতিফলক আছে_ 'রাশেদ হুমায়ূন ঔষধি উদ্যান'। তার নিচে লেখা_ 'আমার ছোট্ট বাবাকে মনে করছি'।

আমার শিশুপুত্র তিন দিনের আয়ু নিয়ে অদ্ভুত সুন্দর পৃথিবীতে এসেছিল। সে এই সৌন্দর্যের কিছুই দেখেনি। আমি প্রায়ই নিজেকে এর জন্য দায়ী করি।

থাকুক পুরনো কথা, হাসপাতালের অন্য গল্প করি।

http://www.facebook.com/Bangla.Ebook

গল্প-১

স্থান : হৃদরোগ ইনস্টিটিউট, শেরেবাংলা নগর।

আমার বড় ধরনের হার্ট অ্যাটাক হয়েছে। ভর্তি হয়েছি হাসপাতালে। নানান যন্ত্রপাতি এবং মনিটর শরীরে লাগানো। আমার বড় ছেলে নুহাশ আমাকে দেখতে এসেছে। নুহাশের বয়স পাঁচ। সে মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে মনিটরের দিকে। মনিটরে ঢেউয়ের মতো রেখা দেখা যাচ্ছে।

নুহাশ বলল, বাবা, এখানে কী হচ্ছে, আমি জানি।

কী হচ্ছে?

এই যে ঢেউয়ের মতো রেখাগুলো দেখছ, একসময় রেখা সমান হয়ে স্ট্রেইট লাইন হবে। তখন তুমি মারা যাবে।

আমি বললাম, ও!

নুহাশ গভীর আগ্রহ নিয়ে মনিটর দেখছে। কখন স্ট্রেইট লাইন হবে, কখন তার বাবা মারা যাবে, এই প্রতীক্ষা।

http://www.facebook.com/Bangla.Ebook

গল্প-২

স্থান : বেলিভিউ হাসপাতাল, নিউইয়র্ক।

আমার এনজিওগ্রাম করা হবে। পায়ের ধমনি কেটে একটা সুই ঢুকিয়ে দেওয়া হবে। সেই সুই চলে যাবে হৃৎপিণ্ডে। আমাকে বলা হয়েছে, এই পদ্ধতিতে প্রতি এক হাজারে একজন মারা যায়। আমি কাগজপত্রে সই করে জানিয়েছি, মৃত্যু হলে দায়-দায়িত্ব হাসপাতালের না, আমার।

অপারেশন হবে ভোর ন'টায়। আগের রাতে আমার কাছে হাসপাতালের একজন কাউন্সিলর এলেন। তিনি বললেন, তুমি কি মুসলিম?

হ্যাঁ।

কাল ভোরে তোমার অপারেশন। তুমি কি চাও তোমার জন্য তোমার ধর্মমতে প্রার্থনা করা হোক?

তার মানে কী?

এই হাসপাতালে রোগীদের জন্য প্রার্থনার ব্যবস্থা আছে। প্রার্থনার জন্য আলাদা ফি আছে। তুমি ফির ডলার জমা দিলেই প্রার্থনার ব্যবস্থা হবে।

হাসপাতাল হলো চিকিৎসার জায়গা। প্রার্থনার জায়গা_ এটা জানতাম না।

কাউন্সিলর বললেন, সমীক্ষায় দেখা গেছে, যাদের জন্য প্রার্থনা করা হয়, তাদের আরোগ্যের হার বেশি। এ জন্যই প্রার্থনা বিভাগ খোলা হয়েছে।

আমি প্রার্থনা করাব না। অর্থের বিনিময়ে প্রার্থনায় আমার বিশ্বাস নেই।

তোমার অপারেশনটি জটিল। তুমি যদি চাও আমি ডিসকাউন্টে প্রার্থনার জন্য সুপারিশ করতে পারি। একজন মুসলমান আলেম প্রার্থনা করবেন।

ডিসকাউন্টের প্রার্থনায়ও আমার বিশ্বাস নেই।

তুমি কি নাস্তিক?

আমি নাস্তিক না বলেই ডিসকাউন্টের প্রার্থনায় বিশ্বাসী না।

ভোর ন'টায় এনজিওগ্রাম শুরু হলো। ডাক্তার একজন অল্পবয়সী তরুণী। আমেরিকান না, ভারতীয় তরুণী। সে কিছু একটা গণ্ডগোল করল। ধমনি ফেটে রক্ত ছিটকে বের হয়ে আমার সামনের মনিটরে পড়ল। ডাক্তারের চোখেমুখেও পড়ল। আমি ইংরেজিতে জানতে চাইলাম, কোনো সমস্যা কি হয়েছে?

তরুণী বলল, ঝঃধু পধষস. অর্থাৎ শান্ত থাকো। আমাকে শান্ত থাকতে বলে সে যথেষ্টই অশান্ত হয়ে পড়ল। একটা পর্যায়ে তাকে সাহায্য করার জন্য অন্য ডাক্তার চেয়ে পাঠাল। আমি মনে মনে বললাম, ডিসকাউন্টের প্রার্থনা নেওয়াই মনে হয় উচিত ছিল।

http://www.facebook.com/Bangla.Ebook

গল্প-৩

স্থান : মাউন্ট এলিজাবেথ হাসপাতাল, সিঙ্গাপুর।

মাউন্ট এলিজাবেথ হাসপাতালে চতুর্থবারের মতো আমার এনজিওগ্রাম করা হয়েছে। রাতটা হাসপাতালের কেবিনে কাটাতে হবে। পরদিন ছুটি। খরচ কমানোর জন্য সিঙ্গেল কেবিন না নিয়ে ডাবল কেবিন নিয়েছি। আমার পাশে আরেকজন অতি বৃদ্ধ চায়নিজ রোগী। দু'জনের মাঝখানে পর্দা আছে। পর্দার ফাঁক দিয়ে আমি বৃদ্ধ রোগীকে দেখতে পাচ্ছি।

রোগীর অবস্থা শোচনীয়। তাঁর মুখে বেলুনের মতো কী যেন লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে। নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে বেলুন ফুলছে এবং সংকুচিত হচ্ছে। অনেকটা ব্যাঙের গলার ফুলকার মতো। রোগী ঘড়ঘড় শব্দ করছে। ভয়ঙ্কর রকম আহত জন্তু হয়তো বা এ রকম শব্দ করে।

রোগীকে দেখার জন্য একের পর এক তাঁর আৎদীয়-স্বজন আসছে। কিছুক্ষণ কেঁদে স্বাভাবিক হয়ে যাচ্ছে। অনেককে দেখলাম রোগীর বালিশের নিচে টাকা গুঁজে দিচ্ছে। দর্শনার্থীরা কেউ কেউ বাচ্চা নিয়ে আসছে। বাবা-মা বাচ্চাদের উঁচু করে রোগীকে দেখাচ্ছে। অনেকটা শেষ দেখার মতো। কুমিরের বাচ্চার মতো দেখানো শেষ হওয়া মাত্র বাচ্চাগুলোকে পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে আমার দিকে। এরা শুরু করে কিচিরমিচির। কেউ কেউ চেষ্টা করে আমার বিছানায় উঠতে।

একসময় মধ্য বয়স্ক এক মহিলা এসে বিনয়ে নিচু হয়ে আমাকে জানাল, তার দাদা মারা যাচ্ছেন বলে সবাই দেখতে আসছে। আমাকে যন্ত্রণার ভেতর দিয়ে যেতে হচ্ছে বলে তাদের লজ্জার সীমা নেই। আমি যেন ক্ষমা করে দেই।

রাত ১০টায় নার্স আমার জন্য ওষুধ নিয়ে এল। আমি জিজ্ঞেস করলাম, ওই বৃদ্ধের কী হয়েছে?

নার্স বলল, বার্ধক্য ব্যাধি।

অবস্থা কি খারাপ?

যথেষ্টই খারাপ। ঘটনা রাতেই ঘটবে।

আমি ভয়ে ভয়ে বললাম, কেউ রাতে মারা গেলে তার ডেডবডি কি তোমরা সঙ্গে সঙ্গে নিয়ে যাও, না পরে নাও?

অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা করা হয়।

আমি বললাম, আমি মৃত মানুষ পাশে নিয়ে কখনো শুয়ে থাকিনি। আমাকে কি অন্য একটা কেবিনে দেওয়া যাবে?

নার্স বলল, অবশ্যই যাবে। তুমি ওষুধ খাও, আমি ব্যবস্থা করছি।

আমি ওষুধ খেলাম। নিশ্চয়ই কড়া কোনো ঘুমের ওষুধ। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ঘুমিয়ে পড়লাম। ঘুম ভাঙল ভোরবেলা। আমি আমার নিজের কেবিনেই আছি। পর্দার ওপাশে কাউকে দেখা যাচ্ছে না। কোনো শব্দও নেই।

সুনসান নীরবতা। ঘটনা নিশ্চয়ই ঘটে গেছে।

আমি অতি কষ্টে বিছানা থেকে নামলাম। উঁকি দিলাম পাশের বিছানায়। বৃদ্ধ হেলান দিয়ে আধশোয়া হয়ে বসে আছে। বৃদ্ধের মুখ হাসি হাসি। সে চামচ দিয়ে স্যুপ খাচ্ছে।

আমাকে দেখে বলল, গুড মর্নিং।

আমি বললাম, গুড মর্নিং।

বৃদ্ধ হাত ইশারা করে আমাকে কাছে ডাকল। বিড়বিড় করে চায়নিজ ভাষায় কী যেন বলল। আমি কাছে এগিয়ে গেলাম। বৃদ্ধ বালিশের নিচে হাত দিয়ে ১০০ সিঙ্গাপুর ডলারের একটা নোট আমার দিকে বাড়িয়ে বলল, টেক টেক টেক। মনে হয়, জীবন ফিরে পেয়ে সে মহা আনন্দিত। এই আনন্দের খানিকটা ভাগ আমাকে দিতে চায়। (পাঠকদের কী ধারণা_আমি কি বৃদ্ধের উপহার নিয়েছি, নাকি নেইনি? কুইজ।)

পাদটীকা-১

এবার ইউরোপের অতি উন্নত একটি দেশের অদ্ভুত চিকিৎসার গল্প। দেশটির নাম সুইডেন। সেই দেশে বাঙালি এক মহিলা দাঁতের সমস্যা নিয়ে গেছেন। দাঁতের ডাক্তার পরীক্ষা করে আঁতকে উঠে বললেন, দাঁতের গোড়ায় ভয়ঙ্কর এক জীবাণু পাওয়া গেছে। এই জীবাণু হার্টে চলে যাওয়া মানে হার্ট ফেলিউর। তিনি ব্যবস্থা দিলেন, রোগীর সব দাঁত জরুরি ব্যবস্থায় তুলে ফেলতে হবে। মহিলা শুরু করলেন কান্না। মহিলার মেয়ে একজন ডাক্তার। সে মাকে বলল, মা, তোমার চিকিৎসা হচ্ছে সুইডেনে, এত ভালো চিকিৎসা কোথাও হবে না। দাঁত ফেলতে বলছে ফেলে দাও।

বেচারির সব সুস্থ দাঁত টেনে তুলে ফেলে দেওয়া হলো। তাঁকে ভর্তি করা হলো ভয়ঙ্কর জীবাণুর চিকিৎসা যে হাসপাতালে হয়, সেখানে। ডাক্তাররা ভয়ঙ্কর জীবাণুর সন্ধানে লেগে গেলেন। একসময় ঘোষণা করলেন, এই জীবাণুর কোনো অস্তিত্ব পাওয়া যায়নি। ভুল হয়েছে। ভুলের কারণেই সব দাঁত ফেলা হয়েছে। তারা দুঃখিত। ভদ্র মহিলা হচ্ছেন নির্বাসিতা লেখিকা তসলিমা নাসরিনের মা। তসলিমা নাসরিন মাকে চিকিৎসা করাতে সুইডেনে নিয়ে গিয়েছিলেন।

পাদটীকা-২

আমি কখনোই মনে করি না, মানুষ এমন কোনো অপরাধ করতে পারে, যার শাস্তি তার কাছ থেকে দেশ কেড়ে নেওয়া। মানুষ মানুষকে ত্যাগ করে; দেশ কখনো তার সন্তানকে ত্যাগ করে না। যাঁরা তসলিমা নাসরিনের রচনা পছন্দ করেন না, তাঁরা পড়বেন না। তসলিমা নাসরিন যদি বিভ্রান্ত হয়ে থাকেন, তিনি থাকবেন তাঁর বিভ্রান্তি নিয়ে। আমরা কেন তাঁকে দেশছাড়া করব? কেন বাংলাদেশের একটা মেয়ে ভবঘুরের মতো এক দেশ থেকে আরেক দেশ ঘুরবে? ভয়ঙ্কর সব যুদ্ধাপরাধীরা তো ঠিকই বাংলাদেশে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আমরা তো তাদেরকে দেশান্তরী করি না।

----------0----------

আসছে ২০১২ সালের বই মেলায়, "অন্যধারা" প্রকাশনী থেকে বের হতে যাচ্ছে, পাঠকদের ভোটে নির্বাচিত সেরা উদীয়মান গল্পকার, তৌফির হাসান উর রাকিব, এর ছোটগল্পের বই "এক"!

বইমেলায় গেলে পাঠকদের অন্তত একবার বইটি হাতে নিয়ে দেখার অনুরোধ করা যাচ্ছে।

http://www.free-bangla-ebook.blogspot.com

অথবা

www.anyodhara.com এ গল্পকারের কিছু লেখা পড়তে পারবেন।